শাফিন রাশেদ এর ধারাবাহিক কিশোর উপন্যাস

ফাহিমের একাত্তর

(প্রথম কিস্তি)

হঠাৎ একটা তীব্র শব্দ শুনতে পেল ফাহিম।
শব্দটা যেন মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। এরপরে পর পর কয়েকটা। শব্দগুলো উত্তর দিক থেকে আসছে। যাচ্ছে দক্ষিণে। আগে কখনো এরকম শব্দ শুনেনি সে।
ফাহিমরা খেলছে বাড়ির উঠানে। ইটের ওপর ইট রেখে বানানো স্ট্যাম্প। টেনিস বল দিয়ে ক্রিকেট খেলছে। ফাহিমের সাথে মিন্টু, রিপন ও কাদের। ওরা ফাহিমের চাচাতো ভাই। উঠোনে মেয়েরাও খেলছে। এক্কাদোক্কা।

সব খেলা থামে গেল।ওরা বোঝার চেষ্টা করলো শব্দটির চরিত্র। মিন্টু বলে উঠলো, গুলির শব্দ মনে হইতাছে।

-হইতে পারে। রিপন বলল।

হঠাৎ রব চাচা বেরিয়ে আসল ঘর থেকে। সে ফাহিমদের কাছকাছি বয়সের। চিৎকার করে রব বলল, এই তোরা মাটিতে বসে পড়। এগুলো গুলি। মনে হয় মিলিটারি আইতাছে। এই তোরা বইসা যা তাড়াতাড়ি।

মাটিতে বসে গেল সবাই। মেয়েরা খেলা রেখে ঘরের দিকে ছুটছে। তখনো গুলি চলছে। উঠানের তিন দিকে বিভিন্ন চাচাদের ঘর। বাচ্চা ও মেয়েদের চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে। বিপদ, কিন্তু কী বিপদ বুঝতে পারছে না কেউ। সুতরাং চিৎকার চেঁচামেচি চলতেই থাকে।

অনিশ্চয়তার চেয়ে বড় বিপদ আর নাই। অনিশ্চয়তা তৈরী করে আতঙ্ক। যে আতঙ্ক ক্রমশ ছড়িয়ে যায়। একসময় চিৎকার চেঁচামেচিও থেমে যায়।

১৯৭১ সালের এপ্রিল, বিকেল অনুমান ছয়টা বাজে । চমৎকার রোদ আকাশে। রোদতো হবেই। রোদের তাপ কিছুক্ষণ আগেও ছিল। ফাহিমরা ঘামছিল প্রত্যেকে। হঠাৎ মেজো চাচার গলা শোনা গেল। জব্বার চাচা। উনি সম্ভবত দৌড়াতে দৌড়াতে আসছেন। বলছেন, মিলিটারি নামছে ঝালকাঠিতে। ওদের গানবোট যাইতাছে গাবখান নদী দিয়া। যাইতে যাইতে গুলি দিতাছে চারদিকে। খবরদার কেউ ঘরতোন বাইরাবা না।

ফাহিমদের বৈদারাপুর গ্রামটি ঝালকাঠি শহরের দক্ষিন-পশ্চিমে, গাবখান ইউনিয়নের মধ্যে। ঝালকাঠি শহরের পাশের সন্ধ্যা নদীটি সোজা দক্ষিনে নেমে যাবার আগে পশ্চিম দিকে একটি শাখা নদীর জন্ম দিয়েছে। গাবখান নদী এর নাম। এটি চলার শুরুতে বামে একটি প্রশাখা নদী দিয়েছে। প্রশাখা নদীটির নাম ধাঁনসিড়ি । জীবনানন্দ দাসের কবিতায় এই নদীটি বার বার উঠে এসেছে। গাবখান নদীটি ফাহিমদের বৈদারাপুর গ্রাম থেকে আড়াই মাইলের মত হবে।

এক সময় মাথার ওপর দিয়ে যাওয়া গুলির শব্দগুলো বন্ধ হল। কিন্তু দূরের কোথাও থেকে শব্দ ঠিকই আসছে। অস্পষ্ট শব্দ। সবাই ঘর থেকে নেমে উঠানে এসে জমায়েত হচ্ছে। দরজার সামনে মাকে দেখল ফাহিম। অন্য ঘরের দরজাগুলোতে চাচিরা এসে দাঁড়িয়েছেন। সবার চোখে মুখে ভয়। চাপা অস্থিরতা।

রব ফাহিমের চেয়ে বড়। তিন-চার বছরের বড়। ফাহিম পড়ে পঞ্চম শ্রেণীতে। অষ্টম শ্রেণীতে রব। যদিও দেখতে ছোট খাটো। ফাহিম গ্রামের বাড়িতে এলে রব চাচার সাথেই কাটায়। টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। গ্রামের পথ-ঘাট, বন-জঙ্গল সবই রবের নখদর্পনে। রবের সঙ্গ ফাহিমের তাই প্রিয়।

গতকাল ফাহিম ও রব গিয়েছিল পাশের গ্রামে মাছ ধরা দেখতে। বহুলোক বিরাট একটা পুকুরে মাছ ধরছিল। কত রকমের যে মাছ। বিরাট একটা বাইম মাছ তোলা হলো এক সময়। প্রায় তিন হাত লম্বা। সবাই ভেবেছিল সাপ। আজ দুপুরেও গিয়েছিল পশ্চিম-বাগানে। আম গাছে উঠে পাকা আম খেয়েছে। কী যে মিষ্টি! পাশেই একটি গাব গাছ। হলুদ পাকা পাকা গাব। যেই দেখা, সেই কাজ। গাছে উঠে পাকা গাব খাওয়া। অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পাশে বসা রব চাচা। ফাহিমকে বলল, চল, বড় রাস্তায় যাই। ওখান থেইকা ঝালকাঠি শহর দেখা যায়। মিলিটারি আসছে নাকি !

ফাহিম রবের পিছন পিছন গ্রামের পাশের ডিস্ট্রিক বোর্ডের রাস্তায় চলে এল। বাড়ি থেকে সাত-আট মিনিটের পায়ে হাঁটার পথ। রাস্তায় উঠে ওদের চোখ ছানাবড়া। শত শত মানুষ রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাকিয়ে আছে উত্তর পূর্ব দিকে। ওদিকের পুরো আকাশ আলোকিত। জ্বলছে ঝালকাঠি শহর। সম্ভবত পুরো শহর। আগুনের শিখা দাউ দাউ করে ওপরের দিকে ছুটছে। কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাই দেখছে। তাদের প্রিয় শহর ঝালকাঠি পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।
ভিড়ের মধ্যে কেউ একজন কেঁদে উঠল। রব চাচা পাশ থেকে বলল, জলিল মুন্সি। ফাহিম জিজ্ঞেস করল, কাঁদছে কেন?

-ঝালকাঠিতে উনার দোকান আছে একটা। উনি ভাবতাছে দোকান পুইড়া ছাই হইতাছে। ভীড়ের মধ্যে আরেকজন বলল, নদীর পাড়ের তেলের ট্যাংকারে আগুন লাগছে মনে হয়। আসলেই তাই। হঠাৎ একটা বড় শব্দ শোনা গেল। সাথে সাথে আগুনের শিখা আরো ওপরে উঠতে শুরু করল।

ঘরে ফিরলো ফাহিম। বড় ভাই ফিরোজ ও বড় বোন মর্জিনা চুপচাপ। খাটে বসে আছে দু'জন, মায়ের পাশে। ফিরোজ ভাই বললেন, একটু আগে স্বাধীন বাংলা বেতার শুনলাম। খবরে বলছে, বরিশালে নাকি যুদ্ধ হইতাছে।

-আব্বুর কি কোন খবর আছে ভাইয়া ?

-না। ফিরোজ বলল।

-আবার রেডিওটা ধরো না, মর্জিনা বলল।

-খবর আরো আধা ঘন্টা পর। এখন গান চলছে। দেশাত্মবোধক গান।

ফাহিমের বাবা মজিদ সাহেব এখন বরিশালে। ডিসি অফিসে চাকরি করেন। সরকারি চাকরি। ঢাকায় যুদ্ধ শুরু হবার পর ফাহিমদের গ্রামের বাড়িতে রেখে গেছেন। পরিস্থিতি যদি কখনও স্বাভাবিক হয়, আবার সবাইকে নিয়ে বরিশাল যাবেন। বাবার নিরাপত্তার কথা ভেবে এখন সবার মন খারাপ। মায়ের দিকে তো তাকানোই যায় না। ফাহিম রেডিওটা নিয়ে মাঝের রুমে চলে গেল। অনেক চেষ্টা করে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ধরতে পারল। আসলেই সেখানে গান বাজছে। ...আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি...।

খুব সকালে ঘুম ভেঙে গেল ফাহিমের। দেখে, তার ঠিক পাশেই ঘুমিয়ে আছে হেনা আপা। কী ব্যাপার, হেনা আপা কখন এলো এ বাড়িতে? হেনা ফাহিমদের ফুফাতো বোন। থাকে পাশের গ্রাম যোগেশ্বরে।

মা বললো, হেনাসহ ওদের বাড়ির সবাই গভীর রাতে এসেছে এ বাড়িতে। ওদের গ্রামের সবার আশঙ্কা ছিল, গভীর রাতে কিংবা ভোরে মিলিটারিরা হয়তো গ্রাম আক্রমণ করবে। যোগেশ্বর গ্রামটি ডিস্ট্রিকবোর্ডের রাস্তার পাশে। এই রাস্তা দিয়ে ভান্ডারিয়া হয়ে পিরোজপুর যাওয়া যায়। মিলিটারি তো আসতেই পারে।

ফাহিমদের গ্রামের নাম বৈদারাপুর। ডিস্ট্রিক বোর্ডের বড় রাস্তা থেকে অনেক দূরে। রাত কাটাতে তাই অনেকেই এ গ্রামে এসেছে। খুব সকাল সকাল আবার ফিরেও গেছে।

গ্রামের যুবকদের মধ্যে অনেকেই মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে শুরু করেছে। ফাহিম শুনল, যারা কলেজে পড়ে, তাদেরই শুধু মুক্তিবাহিনীতে নেয়া হচ্ছে। এর ছোট হলে হবে না। রব বলল, যারা দশম শ্রেণীতে পড়ে, তাদেরও নাকি নিচ্ছে। তবে শরীরে নাকি শক্তি থাকতে হবে। ফাহিমের মন খারাপ। সে মোটে ফাইভে পড়ে। মনে মনে চাইতে থাকল, রব চাচাকে যেন না নেয়।

ফাহিমের এক চাচা দেলোয়ার হোসেন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এ চাকরী করতেন। তিনি পালিয়ে চলে এসেছেন বাড়ি। বিকেলে গ্রামের যুবক ছেলেরা মাঝি-বাড়ির ভিটায় লেফট-রাইট শুরু করলো। দিলু চাচা তাদের ফিটনেস ট্রেনিং দেখাশুনা করতে লাগলেন। ফিরোজ ভাইও দিলু চাচাকে সাহায্য করতে লাগল। সবার মধ্যে একটা উৎসব উৎসব ভাব। গ্রামবাসীদের মনের জোর আস্তে আস্তে ফিরতে শুরু করল।

কেউ কেউ ভারতে অস্ত্রের ট্রেনিং নিতে চলে গেল। শোনা যাচ্ছে, ফিরোজ ভাই যে কোন দিন ঘর ছাড়বে । কেউ কেউ বরিশাল- পটুয়াখালি জোনের কমান্ডার ক্যাপ্টন এম এ জলিলের দলে যোগ দেবার জন্য ঘর ছাড়ল। অন্য উপদ্রবও শুরু হল ফাহিমদের পাশের গ্রামে। একদিন ডাকাতি হল কয়েক ঘরে। ওরা প্রচুর মারধর করে এবং সর্বস্ব নিয়ে যায়। সার্বিকভাবে গ্রামের পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করল। যুবক ছেলেরা যারা যুদ্ধে গেলনা, তাদের জন্য সত্যিই অস্বস্তি।

চার সপ্তাহ পর ফাহিমের বাবা মজিদ সাহেব এলেন বরিশাল থেকে। সবার মুখে হাসি ফুটল। মজিদ সাহেব জানালেন, বরিশাল শহরের অবস্থা তত খারাপ না। এপ্রিলের ২৬ তারিখ মিলিটারি এসেছে বরিশালে। তারা প্রথম এক সপ্তাহ খুব অত্যাচার করেছে। পরে তা কমিয়ে দিয়েছে। মানুষজনও ঘর থেকে বের হতে শুরু করেছে। হাটে বাজারও বসতে শুরু করেছে।

মজিদ সাহেব একদিন শুনলেন,শহরে মাইকিং হচ্ছে। কী ব্যাপার ? সবাই যেন যে-যার কাজে যোগ দেয়। মজিদ সাহেব ভয়ে ভয়ে একদিন অফিসে গেলেন, প্রায় তিন সপ্তাহ পর। না গিয়ে উপায়ও ছিল না। এ ছাড়া খাবে কী ? হাতের টাকা-পয়সা তো শেষ।

মজিদ সাহেব দুই দিন গ্রামে থেকে আবার বরিশাল চলে গেলেন।

এক সন্ধ্যায় ফাহিম ও মিন্টু উঁকি দিল ফিরোজ ভাইয়ের রুমে। উদ্দেশ্য রেডিওতে স্বাধীন বাংলা শোনা। ফিরোজ একটি বই পড়ছিল।ওদেরকে দেখে ভেতরে ডাক দিল।

- কী ব্যাপার?
- স্বাধীন বাংলা শুনবো।
- বেশ, বসো।

ফিরোজ রেডিও অন করে স্বাধীন বাংলা ধরার চেষ্টা করতে থাকল। এক সময় ধরেও ফেলল। গান হচ্ছিল। ‘সালাম সালাম, হাজার সালাম’ গানটি। গান শেষে খবর শুরু হল। অনেক জায়গায় যুদ্ধ চলছে। অনেক জায়গায় চলছে মিলিটারির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। চট্টগ্রামের হিলট্র্যাকসে মিলিটারিরা নাকি একদম সুবিধা করতে পারছে না, ইত্যাদি।

এক সময় মিন্টু হঠাৎ জিজ্ঞেস করল ফিরোজ ভাইকে, পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাথে আমাদের যুদ্ধটা কেন বাধল ?

ফিরোজ ফাহিমের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কী জানো বল।

- ওরা আমাদের ঠকায়। আমরা আর ঠকতে চাই না।

- ঠিক বলেছো। আচ্ছা, তোমরা নিশ্চয়ই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম শুনেছো ?

- হ্যাঁ, উনিই তো আমাদের নেতা। তাকেই তো সবাই ভোট দিয়ে দেশের নেতা বানিয়েছে।

- হ্যাঁ, আমরা গত বছর ডিসেম্বরে ভোট দিয়েছি, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের জন্য। সেই ভোটে বঙ্গবন্ধু জয়ী হয়েছেন। কিন্তু পাকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধুকে দেশ চালানোর ক্ষমতা দিতে নারাজ। তোমরা ভুট্টোর নাম শুনেছো?

-হ্যাঁ, উনার পুরো নাম জুলফিকার আলী ভুট্টো।

-হ্যাঁ, ভুট্টো সাহেব বললেন, শেখ মুজিবকে পাকিস্তান চালানোর ক্ষমতা দেয়া যাবে না। তা হলে পাকিস্তান ভেঙে যাবে।

-এটা কি সত্যি ভাইয়া ? মিন্টু জিজ্ঞেস করল।

-না। এটা ঠিক না। বঙ্গবন্ধু নির্বাচনের আগে বলেছিলেন, আমরা স্বায়ত্বশাসন চাই। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন।

-সেটা কি ভাইয়া? ফাহিম জানতে চাইল।

ফিরোজ বলল, ভারতের কথা ভাব। পাকিস্তানে প্রদেশ কয়টা ? দু'টো। ভারতে তেমনি অনেকগুলো প্রদেশ আছে। এদের প্রত্যেকের একটি সরকার আছে। যারা প্রদেশ চালায়। এই সরকারের সবাই ওই প্রদেশেরই লোক। পাশাপাশি সব প্রদেশগুলো মিলেও একটি সরকার আছে। তাঁরা দিল্লীতে থাকে। সমগ্র দেশের ভাল-মন্দ তারা দেখে। কোন প্রদেশ সাহায্য চাইলে দিল্লীর সরকার তখন সাহায্য করে।

-দিল্লির সরকারের কাজ কী ?

-দিল্লির সরকারের কাজ হলো, প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে কেমন সম্পর্ক হবে, কেমন ব্যবসা বাণিজ্য হবে, সেটা নির্ধারণ করা। অন্য কোন দেশের সাথে যুদ্ধ হলে তখন তা পরিচালনা করবে। সব প্রদেশের টাকার চেহারাও এক রকম। এটাও নিয়ন্ত্রন করে দিল্লির সরকার।

-আচ্ছা, আমরাও কি ভারতের মতো শাসন ব্যবস্থা চেয়েছিলাম ?

-ঠিক তাই। ফিরোজ বললো, কিন্তু পাকিস্তানীরা এটা মানতে রাজি না। তাদের মিলিটারিরা ২৫ মার্চের রাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ট্যাংক, মেশিনগান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঝাঁপিয়ে পড়লো পুলিশ, ইপিআর ও ছাত্রদের উপর।

-বাঙালিরা শুধু মার খাচ্ছে ?

-তা হবে কেন? বাঙালিরা এখন অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। খবরে শুনলে না, সারা দেশে এখন বাঙালিরা রুখে দাঁড়িয়েছে।

-ভাইয়া, বাঙালিরা কি জিততে পারবে ওদের সাথে ? জানতে চাইলো মিন্টু।

-অবশ্যই পারবে।

ফিরোজ বলল, পাকিস্তানী মিলিটারির মধ্যে অনেক বাঙালি সদস্য ছিল। তারাই এখন যুদ্ধ করছে আমাদের হয়ে, পাকিস্থানী মিলিটারিদের বিরুদ্ধে। কিছুদিন আগে চট্টগ্রামে রেডিওতে মেজর জিয়া নামে একজন বাঙালি সৈনিক বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।

(চলবে...)

শাফিন রাশেদ : লেখক ও চিকিৎসক